গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২৪ - ৩০ জুলাই ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

জমি অধিগ্রহণ বিল বাতিল করতে হবে

বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কনভেনশনে দাবি

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার ঐতিহাসিক আন্দোলনকে সংহতি জানিয়েই গড়ে উঠেছিল শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। আজ যখন জমি লুঠ করার বিপদ সমগ্র দেশজুড়ে, তখন সেই বুদ্ধিজীবী মঞ্চই এগিয়ে এল কলকাতার বুকে সর্বভারতীয় কনভেনশন করার উদ্যোগ নিয়ে। ১৬ জুলাই মৌলালি যুবকেন্দ্রের ভিড়ে ঠাসা কনভেনশনে হরিয়ানা, গুজরাট, ওড়িশার নেতারা বলে গেলেন তাঁদের আন্দোলনের কথা। এ রাজ্য থেকে ছিলেন কবীর সুমন, মীরাতুন নাহার, মেহের আলি ইঞ্জিনিয়ার, গীতেশ শর্মা, চন্দন সেন সহ আরও অনেক ব্যক্তিত্ব।

যুবকেন্দ্রের পূর্ণ সভাগৃহে প্রথমে খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সান্টু গুপ্ত। প্রস্তাব সমর্থন করে গুজরাতের মীনাক্ষী যোশি বহু প্রচারিত গুজরাট মডেলের তুলোধোনা করেন। গুজরাটে অধিগ্রহণের স্বার্থে কৃষি জমিকে অকৃষি জমি বলে দেখাতে মিথ্যা নথি বানাচ্ছে সরকারি আমলারা। টাটার ন্যানো কোম্পানিকে ৩০ হাজার কোটি টাকার কর ছাড় দিয়েছে বিজেপি সরকার। রিলায়েন্স, আদানিদের হাজার হাজার একর জমি দান করছে তারা। উৎখাত হওয়া লোকজনকে এরা কখনওই শ্রমিক হিসাবে কাজে নিচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে নানা জায়গায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বড় বড় শিল্পপতিদের কালো টাকা জমিতে বিনিয়োগ হবে। কালো টাকার রমরমা আরও বাড়বে। গুজরাটে মালিকরা শ্রম আইনের কোনও তোয়াক্কাই করে না। পরিযায়ী শ্রমিকরা অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে বলে জানান মীনাক্ষী। গণতান্ত্রিক পরিবেশ অনুপস্থিত। সরকারি হলে মিটিং করতে গেলে জানিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে কোনও সমালোচনা চলবে না। এ এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা।

ওড়িশার পস্কো বিরোধী আন্দোলনের নেতা সদাশিব দাস এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা জানান। এর চাপে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থাটি প্রকল্প গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে বলে তিনি জানান। উপস্থিত সকলে করতালি দিয়ে পস্কো আন্দোলনের এই জয়ের জন্য প্রতিনিধি সদাশিববাবুকে অভিনন্দন জানান। পস্কোর জন্য ২২ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল। ওড়িশার অন্যত্রও ২ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকার। কেওনঝরে ৬ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রেলের সম্পত্তি পুঁজি-মালিকদের দিয়ে দিচ্ছে মোদি সরকার

'রেল কেবলমাত্র একটা যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এ আমার জীবনের অঙ্গ। যাঁরা বলছেন, সরকার রেলকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছেন, তাঁরা মিথ্যা প্রচার করছেন।' বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ বারাণসীতে একটি রেল কারখানা-র অনুষ্ঠানের ভাষণে। মোদিজি কি সত্য বলেছিলেন জনগণকে? নাকি এও সেই 'স্বচ্ছ ভারত' বা 'আচ্ছে দিনে'র মতো তাঁর ফাঁকা আওয়াজ! তা যদি না হয় তাহলে ১৫ জুলাই তাঁর সরকারের রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ৪০০ স্টেশন বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চেয়ে প্রস্তাব পেশ করলেন, মোদিজি কি শুনতে পাননি? তিনিই তো ছিলেন মন্ত্রীসভার বৈঠকের মধ্যমণি!

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'এ-১' এবং 'এ' চিহ্নিত অর্থাৎ দেশের প্রথম সারির ৪০০ স্টেশন ও তার চারপাশের জমি এমনকী আকাশের মালিকানা লিজ ভিত্তিতে তুলে দেওয়া হবে কিছু বেসরকারি কোম্পানির হাতে। তারা সেই জমি নিয়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতে পারবে। বানাতে পারবে বহুতল বাড়ি, শপিং কমপ্লেক্স বা অন্য কিছু। এই জমি তারা অন্যদের লিজও দিতে পারবে। জমির উপরের আকাশ বিজ্ঞাপনে ঢেকে দিতেও বাধা নেই। স্টেশনের উন্নতি করবে এই শর্তে জমির জন্য কোনও টাকা কোম্পানিকে দিতে হবে না। বড় শহর বা বিখ্যাত তীর্থস্থানের স্টেশনই বেছে নেওয়া হবে, যেখানে জমির দর সর্বোচ্চ। মোদিজির সরকারের অন্য সব কিছুর মতোই এই প্রস্তাবেও নাটকীয়তার অভাব নেই। এ জন্য দরপত্র বা টেন্ডার চাওয়া হবে ওপেন বিড পদ্ধতিতে। একজন যে প্রস্তাব দেবে তা পরবর্তী দরদাতারা দেখে উন্নততর প্রস্তাব পেশের সুযোগ পাবেন। দরপত্রগুলি 'সৃষ্টিশীল প্রস্তাবে' ভরা থাকবে বলে সরকারের আশা। এই উন্নয়নের নাম তাঁরা দিয়েছেন রিডেভলপমেন্ট বা পুনর্উন্নয়ন। স্টেশনগুলি শুধু ঝাঁ-চকচকে হবে না, হবে বিশ্বমানের। রেল কর্তারা বলছেন এর ফলে যাত্রীরা অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। কী আধুনিক ব্যবস্থা? থাকবে ওয়াইফাই, ফুড প্লাজা, ক্যাসিনো, নিঃশুল্ক বিদেশি জিনিস কেনার দোকান, কোথাও বা সুইমিং পুল, এমন অনেক কিছু। ঝুলন্ত রেস্তোরাঁ বা বাগানের চমকও থাকতে পারে।

কিন্তু এর ফলে কি সর্বসাধারণের জন্য রেল চলাচল অত্যাধুনিক হবে? রেলমন্ত্রী মশাই এমন প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি জানুয়ারি মাসে শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে বলেছিলেন ভারতীয় রেলের উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি বেসরকারি লগ্নি চাই, কারণ রেলের নাকি পুঁজির অভাব। রেলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নাকি বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। সত্যি নাকি! ২০১৫-১৬ সালের রেল বাজেটে তিনি বলেছেন ঋণ, বেতন ও অন্যান্য খরচ সহ সমস্ত দায় মিটিয়েও রেল কেন্দ্রীয় সরকারকে ৫ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা লভ্যাংশ দিয়েছে। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকির গল্পটি দাঁড়ায় কি? পুঁজির অভাবে রেলের উন্নয়নের গতি থমকে গেছে এই গল্পটিও সত্য নয়। রেলের বাজেটই বলছে চলতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে চলেছে রেল, লাভ হবে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। তাহলে পুঁজির অভাবের গল্প বেশ কিছুদিন ধরেই জনগণকে যে শোনানো হচ্ছে তার পিছনে দেশি বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের স্বার্থই আসল। রেল স্টেশনের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বামপন্থী দলসমূহের দুর্নীতি-বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য দাগি মন্ত্রীদের অপসারণের দাবিতে ছ'টি বামপন্থী দলের সিদ্ধান্তে ২০ জুলাই সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে বিভিন্ন রাজ্যে মিছিল, সভা, বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির দুর্নীতির তদন্ত ও দোষী নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তির দাবিও তোলা হয়। কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে বিরাট মিছিল রাজভবন অভিমুখে যায়। রানি রাসমণি রোডে পুলিশ আটকালে সেখানে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, সৌমেন বসু, মঞ্জুকুমার মজুমদার, মনোজ ভট্টাচার্য, কার্ত্তিক পাল, হাফিজ আলম সৈরানি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রেলের সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছে সরকার

একের পাতার পর

উন্নতির নাম করে ২০১২ সালে কংগ্রেস সরকার তৈরি করেছিল ইন্ডিয়ান স্টেশন ডেভলপমেন্ট করপোরেশন। সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয় ধনকুবের। কিছু স্টেশনের চারপাশের জমি নিয়ে তাঁরা ব্যবসার ছাড়পত্রও পেয়ে গেছেন। হয়েছে শপিং মল, বহুতল বাড়ি, বিলাসবহুল হোটেল রেস্তোরাঁ। সাধারণ হকাররা রেল স্টেশনে বিক্রির অধিকার হারিয়ে রাস্তায়। যাত্রীরা ৫ টাকার বদলে ২৫ টাকায় নামকরা রেস্তোরাঁর ছাপ মারা কাগজের কাপে 'উন্নত' চা খাচ্ছেন, বড় স্টেশনে বা দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় নামী 'ফুড প্লাজা'র নিরামিষ খাবার ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমিষের দাম তো আরও বেশি। নানা অজুহাতে রেলের টিকিটের দামও বেড়েছে। তৎকাল এবং প্রিমিয়াম ট্রেনের টিকিট বিক্রি হচ্ছে ডায়নামিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ যত চাহিদা বাড়ে তার সঙ্গে ভাড়া বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। বলা যায় রেল নিজেই এখন টিকিট নিয়ে কালোবাজারি করছে। আইআরসিটিসি-র মাধ্যমে পিপিপি মডেলে অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ট্রেনের টিকিট বিক্রি থেকে প্যান্ট্রি কারে খাবার সরবরাহ চলছে। সাধারণ এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে সুপারফাস্ট ছাপ মেরে দিয়ে চলছে অন্যায়ভাবে বাড়তি ভাড়া আদায়। তাতে সাধারণ মানুষের রেল যাত্রার যন্ত্রণার কি কোনও উপশম হয়েছে? শহরতলির ট্রেনের বাদুড় ঝোলা ভিড়ের কি কোনও সুরাহা হবে? দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া, জীর্ণ রেল লাইন মেরামত, উন্নত সিগন্যালিং হয়নি। যেমন হয়নি রেলযাত্রায় দুষ্কৃতীদের হাত থেকে যাত্রীদের বাঁচানোর ব্যবস্থা। সাধারণ কামরা, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী ভ্রমণ করেন, তার সংখ্যা বাড়েনি। ভাঙা জীর্ণ বগি, দুর্গন্ধময় শৌচালয়, বন্ধ পাখা নিয়েই ট্রেন চলছে। সাধারণ স্লিপার শ্রেণির বগিগুলির হাল শোচনীয়। রেল কেবলমাত্র কিছু বাতানুকুল ট্রেন ছাড়া কোনও রেকেরই দেখভাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেন পরিষ্কারের দায়িত্ব বর্তেছে কিছু বেসরকারি কোম্পানির হাতে। তাদের নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকরা ট্রেনে উঠে কিছুটা ঝাঁট দিয়ে আর স্প্রে করে কেমন অনুনয় করে যাত্রীদের কাছে সই চান, সে অভিজ্ঞতা দূরপাল্লার বহু যাত্রীর আছে। তাতে ট্রেন পরিষ্কারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অবসান ঘটেছে। সময়ানুবর্তিতায় রেল ডাহা ফেল। সময় না মানাটাই দস্তুর, টাইম টেবল মেনে ট্রেন চলাটাই ব্যতিক্রম।

রেলের মূল আয়ের উৎস পণ্য পরিবহণ। সেই পণ্য পরিবহণের জন্য মালগাড়ি চলাচলের বিশেষ লাইন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর তৈরির কথা রেল কর্তারা দীর্ঘদিন ধরে বলছেন। কিছু করিডর তৈরিও হয়েছে। তাতে পণ্য পরিবহণের কোনও উন্নতি হয়নি। হয়েছে শুধুমাত্র লাইনের দুই পাশের জমি নিয়ে ফাটকাবাজি। মোদি সরকারের জমি নীতিতেও বলা হয়েছে রেল লাইনের পাশের জমি অধিগ্রহণের সুবিধা করে দিতে সরকার বধ্যপরিকর। এই জমির দিকেই সবচেয়ে বেশি নজর বহুজাতিক ধনকুবেরদের। এই জমির দিকে তাকিয়েই বিশ্বায়নের মডেল অনুসরণ করে ২০০৫ সালে তৈরি হয়েছিল রেলওয়ে ল্যান্ড কর্পোরেশন। বেসরকারি শেয়ারহোল্ডাররা তাতে বিনিয়োগও করেছেন। জনসাধারণের পয়সায় তৈরি রেলের পরিকাঠামোকে ধনকুবেরদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই এই কোম্পানির কাজ। নতুন রেল লাইন বা পুরনো লাইনের সম্প্রসারণের জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না বলে যে হাহাকার তোলা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হল জমির ফাটকাবাজির সুবিধা করে দিতে আরও বেশি বেশি জমি অধিগ্রহণের অবাধ ব্যবস্থা করা। রেলের জন্য জমির অভাব নেই, লাইনের দু'পাশে দুই কিলোমিটার এলাকায় জমি দখল করে ব্যবসার জমি নিয়েই সমস্যা। তাই পিপিপি মডেলে ইন্ডিয়ান স্টেশন ডেভলপমেন্ট করপোরেশনে কুলোচ্ছে না। একচেটিয়া মালিকরা বলছে আরও দ্রুত জমি চাই। সে কারণেই নতুন পরিকল্পনা ৪০০ স্টেশনের জমি বেচতে কোনও কর্পোরেশন লাগবে না। সরকারি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। যে স্টেশনগুলি বেছে নেওয়া হবে তাদের আশেপাশে জমির দাম দেশের মধ্যে সর্বাধিক। ফলে যারা বিনিয়োগ করবে তাদের প্রচুর লাভ হবে। সাধারণ যাত্রীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবেন।

রেল দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা। রেলের সুষ্ঠু পরিচালনার উপর নির্ভর করে অসংখ্য মানুষের রুটি রুজি। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড় অংশ রেলের উপর নির্ভরশীল। রেলের এই গুরুত্বের জন্যই দেশি বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের নজর পড়েছে রেলের উপর। তারা জানে রেলের ভাড়া যতই বাড়ুক সাধারণ মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে হলেও তা দিতে বাধ্য। রেলের বিশাল পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে জনগণের টাকায়। এই পরিকাঠামোকে একলপ্তে কেনা কোনও বৃহৎ পুঁজির পক্ষেও মুশকিল। তাই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রির জন্য কংগ্রেস আমল থেকেই নানা করপোরেশন, কোম্পানি তৈরি করা হচ্ছে। যাতে বিনিয়োগ করছে পুঁজিপতিরা। তাতে রেলের উন্নতির বদলে অবনতিই হচ্ছে। কারণ সামগ্রিক পরিকল্পনার বদলে সমস্ত কোম্পানিগুলি নিজ নিজ অংশে লাভ তুলতেই ব্যস্ত। তাই যখন এদেশে জীর্ণ ব্রিজ ভেঙে ট্রেন নদীতে পড়ছে তখন ইরকন বা রেলের পরিকাঠামো নির্মাণ কোম্পানি আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে রেল পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যস্ত। সেখানে পুঁজি ঢালছে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকরা। এমনকী সিগন্যাল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ভারও এবার যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। তারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও বানাবে। ইঞ্জিন তৈরি, ওয়াগন এবং বগি তৈরির ভার তো বহুদিন থেকেই বেসরকারি হাতে যেতে শুরু করেছে। যে সংস্থাগুলি এখনও রেলের হাতে আছে তারাও চলছে পিপিপি মডেলে। বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম নিয়োগকারী সংস্থা রেলের কর্মী সংখ্যা ১৩ লক্ষ হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। ধীরে ধীরে এর বিরাট অংশকে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীতে পরিণত করা হচ্ছে। শূন্যপদে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। ঘাটতি কর্মী দিয়েই চলছে রেলের কাজ। ক্লান্ত শরীরে ট্রেন চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছেন ড্রাইভার গার্ডরা। রেল পরিচালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বেসরকারি কোম্পানির সাথে চুক্তিভিত্তিতে চালানোর চেষ্টার ফলে দক্ষতা কমছে। যার মাশুল দিচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা। কেবল মুনাফার উদ্যেশ্যেই রেল চললে এই মাশুল আরও দিতে হবে।

মোদিজি গল্প শোনান তিনি নাকি শৈশবে রেল স্টেশনে চা বিক্রি করতেন! তাঁর সরকারের স্টেশন উন্নয়নের যে পরিকল্পনা তাতে এমন চা বিক্রেতারা তো স্টেশনের ধারে কাছে আর ঘেঁষতেই পারবে না। গরিবের প্রতি তাঁর দরদ বটে! মোদিজি কি তাহলে বারাণসীতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা নাম জপতে জপতে বেসরকারিকরণ হবে না বলে ডাহা মিথ্যা বলেছিলেন! নাকি সত্য গোপন করেছিলেন? একচেটিয়া মালিকরা তাদের সংকট থেকে মুক্তির আশায় গাঁটের কড়ি খরচ করে মোদিজিকে মসনদে বসিয়েছে। তারা এখন চাইছে সেই খরচ উসুল করতে। একের পর এক ক্ষেত্র তাদের হাতে তুলে দিতে তাই মোদি সরকার বদ্ধপরিকর। জমিতে বিনিয়োগই তাদের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে লোভনীয় ক্ষেত্র। সে জন্যই রেল স্টেশনের জমিতেও পড়ছে কোপ। এই সর্বনাশকে প্রতিহত করতে হবে। না হলে অচিরেই রেল সামগ্রিকভাবেই বেসরকারি পুঁজির লোভনীয় শিকার হয়ে উঠবে।

বর্ধমানে মহিলা বিক্ষোভ

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা, হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা, ১০০ দিনের কাজ ও বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবিতে ২ জুলাই ডেপুটেশন দেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা দুই শতাধিক মহিলা। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড শ্যামলী মুখার্জী, লোকাল সম্পাদিকা কমরেড অত্রী গোস্বামী এবং এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাতী গোস্বামী। প্রতিনিধি দল লাউদোহা বি ডি ও-র নিকট দাবিপত্র পেশ করেন। পর দিন তিনি সংগঠনকে চিঠি দিয়ে জানান, দাবিগুলি এস ডি ও এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছেন।

তৃণমূল-বিজেপি সখ্যতায় আর আড়াল নেই

তৃণমূল নেত্রী শেষ পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধী এবং নরেন্দ্র মোদির মধ্যে দোলাচল কাটিয়ে ফেললেন। আসন্ন বাদল অধিবেশনে রাজ্যসভায় তাঁর দলের ভোটে হয়ত পণ্য ও পরিষেবা বিল পাশ করিয়ে নিতে পারবে মোদি সরকার। সেই আশ্বাস দিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। গত সংসদ অধিবেশনে খনি বিল, বিমা বিল ইত্যাদি যে সমস্ত বিল এনে নরেন্দ্র মোদি পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার অবাধ বন্দোবস্ত করে দিতে চেয়েছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদরা কখনও ওয়াক আউটের কৌশল নিয়ে, কখনও সরাসরি পক্ষে ভোট দিয়ে সেগুলি পাশ করিয়ে দিতে তাঁকে সহায়তা করেছেন।

কোথায় গেল বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রীর সেই রণং দেহী ইমেজ? ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদিকে কোমরে দড়ি পরাবার ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির তাবড় নেতারা এ রাজ্যে এসে সারদা কেলেঙ্কারির সূত্র ধরে 'ভাগ মমতা ভাগ' স্লোগান দিয়ে বাজার মাত করেছিলেন। এই সব তরজা গানের সভায় শ্রোতারাও ভিড় জমাচ্ছিলেন খুব। সারদা নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যবাসী বিজেপির ভোটের ঝুলিও কিছু কিছু ভরেছিলেন। কিন্তু কোথায় কী? 'ভোটের লাগিয়া ভিখারি সাজিনু, ফিরিগো যে দ্বারে দ্বারে। আমি ভিখারি নই শিকারি যে' — ভোট রাজনীতির এ কথাটা মানুষ ঠিক পুরোটা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। তাই শিকারিদের পাল্লায় পড়ে আশা করেছিল সারদা মামলার প্রকৃত বিচার হবে। লোকসভা নির্বাচনের পরে পরে সিবিআই একে ডাকছে, ওকে চিঠি পাঠাচ্ছে, কারওর গোপন জবানবন্দি নিচ্ছে ইত্যাদিতে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গিয়েছিল। রাজ্য রাজনীতি এই নিয়ে তখন সরগরম। টিভি মিডিয়ায় বিজেপি সহ নানা রঙের বিরোধীরা আসর মাত করে আলোচনা চালাচ্ছেন কার কার জেল হবে। বিজেপি নেতারা ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছেন প্রথমে কে, তার পরে কোন মহারথী, আর তারও পরে কোন নেত্রীর ঘাড়ে সারদা খাঁড়ার ঘা পড়বে। শেষ পর্যন্ত সব ফানুস ফেটে গেল।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবেই তৃণমূল নেতা মুকুল রায় সরে গেলেন। মমতাজি দিল্লি উড়ে গেলেন মোদিজির সাথে একান্তে কথা বলতে। প্রধানমন্ত্রীও কলকাতায় এসে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একান্তে কথা সারলেন, যার সারমর্ম বাইরে প্রকাশ হল না। তার পরেই ঢাকা সফরে মোদি-মমতা জুটিকে দেখা গেল। এর ঠিক আগে আসানসোলে নেত্রী মঞ্চ শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে। বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে পথে গাড়িতে তুলে নিয়ে ভেলপুরি খাওয়ানো নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। নরেন্দ্র মোদির যোগ দিবস নিয়ে রাজ্যে যোগ শিবিরের আয়োজনও পরিষ্কার ইঙ্গিত। তার পর রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদদের ভূমিকা তো প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যায়, ডিল হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়েই। যার বিনিময়মূল্য দিতে বিজেপির সাম্প্রতিক ললিত মোদি এবং ব্যপম কেলেঙ্কারির চরম দুর্নীতি ফাঁসের ঘটনায় তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর দল নীরব।

সারদা ডিল হয়ে যাওয়াতেই অমিত শাহ এবারে মমতাজির বিরুদ্ধে আর 'ভেগে যাওয়ার' ডাক দেননি। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও হুঙ্কার দেননি। শিষ্যদের চেপেচুপে চলবার নির্দেশ দিয়ে ধৈর্য ধরে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চালাতে বলে গেছেন। নীতি নয়, আদর্শ নয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নয়— শুধুমাত্র 'মিসড কলেই' সদস্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাজ্য নেতাদের নির্দেশ দিয়ে 'মহাসম্পর্ক অভিযান' এর সূচনা করে গেছেন।

রাজ্যের যুযুধান ভোটপাখি রাজনৈতিক দলগুলোর এই কার্যকলাপের সাথে জনগণের স্বার্থ কোথাও বিন্দুমাত্রও জড়িয়ে নেই। এ কথাটা মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাপনে বুঝতে পারে। এদের সংগঠিত দাপটে মানুষ আরও অসহায় হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের হাতে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার পুঁজির পাহাড় জমেছে দেশ বিদেশের মানুষকে শোষণ করে, সেই পুঁজিই চালাচ্ছে এই সব রাজনৈতিক দলগুলোকে।

গণতন্ত্রের মূল কথা ছিল মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার। গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তার পরিসর প্রস্তুত হত। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই যাদের রাজনীতি তারা মানুষের দাবি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলে তার সমাধানের পথে উৎসাহী হয় না। মানুষের শক্তির ঘুমন্ত দৈত্যকে জাগালে তাদের রাজনীতি টিকবে না। আন্দোলনের নামে মানুষকে তারা ততটুকুই খ্যাপাবে যতটুকুতে তাদের ভোটের ফয়দা হয়। আন্দোলনের পথ ব্যতিরেকে সংসদীয় যে পথ পড়ে থাকে সেই পথ এখন দুর্নীতির জন্মই দিতে পারে। বাজার সংকটে ভোগা পুঁজির পাহাড় যেখানে যতটুকু সম্ভব সুবিধা পেতে দুর্নীতির আশ্রয় নেবেই। অন্ধকার পথে কালো টাকার জন্ম দেবে। তাই দেশের ভোট লোলুপ প্রত্যেকটি দল দুর্নীতির পাঁকে ডুবছে। এর বাইরে তারা এক পাও যেতে পারে না। জনস্বার্থের দোহাই পেড়ে তারা অনেক 'বাক্যি' রচনা করতে পারে, জনস্বার্থে কাজ করতে পারবে না। বরং পর্দার পিছনে তারা মিলেজুলে পুঁজির স্বার্থই দেখতে পারে।

ছিটমহল বিনিময় প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেকে আশা করছেন, এই চুক্তি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান ঘটবে। প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জনগণ এই প্রত্যাশায় সমর্থনও জানিয়েছেন। তবুও সমস্যা কিছু থাকছেই, যার সমাধান করা দরকার।

ছিটমহলের সমস্যা

১৯৪৯ সালে ব্রিটিশের করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের ভারতভুক্তি ঘটে। এই সময় দেখা যায় বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) অভ্যন্তরে ১৩০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বীপের মতো অবস্থান করছে, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের ৯৫টি ভূখণ্ড ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থান করছে। এইগুলি ছিটমহল বা এনক্লেভ নামে পরিচিতি। ফলে ছিটমহল হল দুই দেশেরই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড, যা সংশ্লিষ্ট দেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয় কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির পরই।

এখানকার অধিবাসীরা চরম দুরবস্থার মধ্যে বসবাস করেন। প্রথমত, এঁরা তাঁদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করেন। অথচ সব রকম আইনগত সুযোগ-সুবিধা— থানা, কোর্ট-কাছারি প্রভৃতি কাজের জন্য তাঁদের মূল ভূখণ্ডের সাথেই যোগাযোগ করতে হয়। এজন্য বিদেশি রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে তাঁদের যাতায়াত করতে হয়, যার ফলে তাঁদের অত্যন্ত হেনস্থার শিকার হতে হয়। ছিটমহলের অধিবাসীরা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য— এককথায় জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে, মূল ভূখণ্ডের কোনও উন্নয়ন কর্মসূচি বা পরিকল্পনাগুলোর কোনও সুযোগ সুবিধাই এঁরা পান না। খরা-বন্যা-মড়ক হলে ত্রাণ পৌঁছে দেবারও কোনও ব্যবস্থা নেই। তাঁদের কোনও সচিত্র পরিচয়পত্র নেই। জন্ম-মৃত্যু হলে রেজিস্ট্রেশন হয় না। পাকা রাস্তা নেই, চিঠিপত্র পৌঁছানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু অদম্য মানসিক শক্তি সম্বল করে তাঁরা মাঠে ফসল ফলান। বলা ভাল, যেন বেঁচে মরে আছেন তারা। এই দুর্দশার কারণও তাঁরা জানেন না। তৃতীয়ত, এই সব ছিটমহলের জনজীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। চুরি-ডাকাতি করে সমাজবিরোধীরা আশ্রয় নেয় বিদেশি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিটমহলে; আবার ছিটমহলে লুটতরাজ চালিয়েও সরে পড়ে বিদেশি রাষ্ট্রে। কারণ এখানে প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। ছিটমহলগুলিতে নারীদের অবস্থা ভয়াবহ। নারীদের প্রতি নির্মম অত্যাচার, অপহরণ, ধর্ষণ নিত্য ঘটনা। বিচারের কোনও বালাই নেই। চতুর্থত, ছিটমহলের বাসিন্দারা বাঁচার তাগিদেই বাধ্য হন ঘিরে থাকা বিদেশি রাষ্ট্রের নিকটবর্তী এলাকার সাথে অর্থনৈতিক-সামাজিক লেনদেন গড়ে তুলতে, যা আসলে বেআইনি। এর সুযোগ গ্রহণ করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাঁদের অবাধ শোষণ, ব্ল্যাকমেইল চালিয়ে যায়, পুলিশ-প্রশাসনও একইভাবে সুযোগ নেয়। উভয় রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যখন তাঁদের ছিটমহলে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন তখন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশাসন দিয়ে তাঁদের 'এসকর্ট' বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন। সেই 'এসকর্ট' বাহিনী আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মূল ভূখণ্ডের সাথে এই জটিল প্রক্রিয়াতেই প্রশাসনিক যোগাযোগ যতটুকু সম্ভব রক্ষা করা হয়। ফলে প্রশাসনহীন পরিস্থিতিতে দুই দেশের সাধারণ অধিবাসীরা নানা রকম হয়রানির শিকার হন।

সমস্যা সমাধানে এতদিনের চেষ্টা

এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে লোকদেখানো কথাবার্তা মাঝেসাঝে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান অধরাই থেকে গিয়েছে। উপরন্তু দেশের ভূখণ্ড, ভৌগোলিক অবস্থান, জনজীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতার ফলে দুই দেশের সরকার সমস্যার সমাধানের নামে যেসব চুক্তি করেছে, তা নতুন করে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ফিরোজ খাঁ নুন-এর মধ্যে একটা চুক্তি হয়— যা নেহেরু-নুন চুক্তি নামে খ্যাত। চুক্তির ৩নং ধারায় দক্ষিণ বেরুবাড়ির একাংশ পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১০নং ধারায় ভারতের ১২৬টি (৪টি ভারতে যুক্ত হয়) ছিটমহলের সাথে পাকিস্তানের ৯৫টি ছিটমহল বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ১২ বর্গমাইল অতিরিক্ত জমি লাভ করত। এক্ষেত্রে বলা হয় —Exchange of old coochbehar enclaves in Pakistani and Pakistan enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan is agreed to. অর্থাৎ পুরনো কোচবিহারের যে সকল ছিটমহল পাকিস্তানে রয়েছে এবং যেসব পাকিস্তানি ছিটমহল ভারতে রয়েছে, তাদের বিনিময় হবে, কিন্তু এর ফলে কিছু বাড়তি জমি পাকিস্তান পেয়ে গেলে, তার ক্ষতিপূরণের দাবি করা হবে না।

কিন্তু চুক্তিটি কার্যকর হতে পারেনি। কারণ ঐ চুক্তির ৩নং ধারায় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ বেরুবাড়ির একাংশ পাকিস্তানকে দিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। তখন জ্যোতি বসু, সুবোধ ব্যানার্জীর মতো বামপন্থী নেতারা বেরুবাড়িকে ভারতের অবিতর্কিত অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বলেন। ১৯৬০ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে সর্বদলীয় সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ও পক্ষে আসে। বেরুবাড়ির প্রশ্নে এই গুরুতর ভুলের কারণে চুক্তিটি আটকে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ জন্মলাভ করার পর ১৯৭৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে ঐ বিষয় নিয়ে নতুন করে চুক্তি হয় — যা ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ-বেরুবাড়ির ওপর দাবি ছেড়ে দেবে (যা নেহেরু-নুন চুক্তির ৩ নং ধারায় ছিল), তার পরিবর্তে মেখলিগঞ্জ থানার অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ছিটমহল দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতাকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে একটি করিডর (১৭৮মি লম্বা, ৮৫ মিটার চওড়া) বা রাস্তা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী লিজ হিসাবে দেওয়া হবে এবং বাদবাকি ছিটমহল বিনিময় হবে। ঐ করিডরই তিনবিঘা নামে পরিচিত।

এখন নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরকম একটি করিডর করার ফলে সংলগ্ন ভারতের কুচলিবাড়ি অঞ্চল (যার বর্তমান লোকসংখ্যা — ৫০ হাজার এবং আয়তন ১৬,৫৮২ একর) নতুন ছিটমহলে পরিণত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়। এই কারণে সেখানকার জনগণ প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবরের মৃত্যু হয় এবং ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতাচ্যুত হন। ফলে চুক্তির রূপায়ণ স্থগিত থাকে।

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চুক্তি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তিনবিঘা করিডর দিয়ে দেবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই সময় কংগ্রেস ও সিপিএম বাদে অন্য সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮১ সালের ৬ জুন ঐ আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ গুলি চালায়, সংগ্রামী কৃষক সুধীর রায় নিহত হন। এই শক্তিশালী আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার পিছু হটে।

১৯৮২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের মধ্যে চুক্তি হয়। এই চুক্তি ইন্দিরা-এরশাদ চুক্তি নামে পরিচিত। এর ফলে তিনবিঘা করিডরের উপর দিয়ে উড়ালপুল বা নিচ দিয়ে একটি সাবওয়ে তৈরি করে ঐ পথেই কুচলিবাড়ির জনগণের যাতায়াতের সিদ্ধান্ত হয়, যার অর্থ ভারত ভূখণ্ড দিয়ে যাতায়াতের কোনও সুযোগ থাকবে না। এই সময় সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা হয়। ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করে দেয়। তখন আবার তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ শুরু হয়।

১৯৯২ সালে ভারতের বিদেশ সচিব জে এন দীক্ষিত এবং বাংলাদেশের অতিরিক্ত বিদেশ সচিব এইচ মামুদ আলির মধ্যে তিনবিঘা সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। এবং ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। জনগণের প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এস ইউ সি আই (সি), সমাজতান্ত্রিক ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে জনগণ ব্যাপকভাবে জড়িত হন। সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বামফ্রন্ট ঐ চুক্তি রূপায়ণের পক্ষে প্রচারভিযানে নামে। নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথভাবে এই আন্দোলন দমন করার পথ বেছে নেয়। দুই জন সংগ্রামী কৃষক জিতেন রায় ও জিতেন অধিকারী শহিদ হন। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়, সামগ্রিক ছিটমহল বিনিময়ের দাবি ওঠে।

রক্তের বিনিময়ে আন্দোলনের ফলে কুচলিবাড়ির জনগণ ২৪ ঘন্টা ঐ করিডর দিয়ে যাতায়াতের অধিকার অর্জন করেন। ঐ প্রতিরোধ গড়ে না উঠলে ইন্দিরা-মুজিব-এরশাদ চুক্তি অনুসারে কুচলিবাড়ির জনগণ ভারত ভূখণ্ড দিয়ে বর্তমানের মতো যাতায়াত করতে পারতেন না। (চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে এ অধিকার নাও থাকতে পারে)। কিন্তু করিডরের উপর অধিকার পেলেও ছিটমহলের মূল সমস্যা থেকেই যায়। কারণ, ছিটমহল বিনিময় হল না।

বর্তমান অবস্থা

সরকারি সমীক্ষা মতে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত ভারতের মোট ছিটমহলের সংখ্যা ১২৬টি, যার মোট আয়তন প্রায় ৩১ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫০ হাজার (এখনও প্রকৃত হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি)। পক্ষান্তরে ভারত ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা - ৯৩টি, যার আয়তন ৭ বর্গ কি.মি., জনসংখ্যা আনুমানিক ৩৫ হাজার। ছিটমহলের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে।

কুচলিবাড়ি অঞ্চলের চারিদিক বাংলাদেশ, একদিকে তিস্তা নদী এবং বর্তমানে বাংলাদেশকে করিডর দেওয়ার ফলে কার্যত নতুন করে কুচলিবাড়ির জনগণ খুবই আতঙ্কিত। দহগ্রাম, আঙ্গারপোতা দুটো ছিটমহল (যার ক্ষেত্রফল আনুমানিক ১২ বর্গ কিমি) করিডর দিয়ে যুক্ত থাকায় সেগুলির সাথে ভারত ভূখণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ থাকলেই। যা দুই দেশের জনগণের পক্ষে সুখকর হবে বলে মনে হয় না। কারণ দুই দেশের শাককরাই নিজেদের হীনস্বার্থে এই এলাকাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের জনগণের ঐক্য-সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার সুযোগ পাবে — এটাই আশঙ্কা। তা ছাড়া কাঁটাতার দিয়ে ঘিরতেও বেশ সমস্যা হবে। ফলে এলাকাটি হয়ে পড়বে অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

ভারত-পাকিস্তান গড়ে ওঠার পর সীমান্ত অঞ্চলের সাধারণ জনগণকে অশেষ দুর্ভোগে ভুগতে হয়েছে, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অবাঞ্ছিত ঘটনার শিকার হতে হয়েছে। দুষ্কৃতীরা, জমি মাফিয়ারা এই সব এলাকায় অত্যাচার চালিয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে এই সব ছিটমহলের অধিবাসীদের একটা ভাল অংশ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন। আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে আজও অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছেন। এরাই আজ ছিটমহলের উদ্বাস্তু নামে পরিচিত। ৩১ আগস্ট ১৯৯২ সালেও মহিলা ও শিশু সহ ৬৭ জন ভারতীয় ছিটমহল বাসীকে খুন করা হয়। হাজার হাজার বাড়িতে লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতীরা। জীবিতরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নেয়। মূল ভূখণ্ডে এসেও সরকারের উদাসীনতায় কোনও রূপ সাহায্য না পেয়ে তাদের অনেকেই ফিরে যান। ফেরামাত্রই খুন হন একজন— সহিদুল ইসলাম। এদেরও একটা বিরাট অংশ পরিচয়হীন হয়ে গেছেন।

এ ছাড়া কিছু দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ বংশ পরম্পরায় এই ছিটমহলগুলোতে বাস করছেন। এদের অনেকে জীবিকার প্রয়োজনে বা সন্ত্রাসের কারণে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ইতিপূর্বে প্রশাসন জনগণনার কাজ করেছে, এদের নাম তখন নথিভুক্ত করা হয়নি, নথিভুক্তির দাবি করা হলেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। আজ যখন স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ করার প্রশ্নে গণনা ও মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে, এদের নিজ নিজ জন্মস্থানে অর্থাৎ ছিটমহলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া যারা ভূমিহীন-খেতমজুর বা বর্গাচাষি ছিল তাদের হাতে প্রকৃতপক্ষে নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণ নেই।

দীর্ঘদিন দুই দেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলবাসীরা অরক্ষিত, অবহেলিত থাকায় নিরাপত্তার কারণে ও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এঁদের অনেকেই সেই সব ভূখণ্ডে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড করেছেন, স্কুলে-কলেজে সন্তান-সন্ততিদের পড়াচ্ছেন, সমস্ত নাগরিক পরিষেবা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এঁদের মধ্যে স্বল্প হলেও একটা সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু একটা ভালোসংখ্যক ছিটমহলবাসী বাইরে থাকলেও জীবন -জীবিকার প্রশ্নে তাদের বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত জমিতে অথবা জোতদারদের বর্গাচাষি হিসাবে ছিটমহলেই দীর্ঘদিন ধরে চাষবাস করছেন। এখন যদি বলা হয় এঁরা বাইরে থাকেন, তাই ছিটমহলের চাষের জমিতে এঁদের অধিকার থাকবে না, তাহলে এঁরা জলে পড়বেন। এমন বিপদের সম্ভাবনায় দরিদ্র ক্ষুদ্র চাষি, বর্গাচাষিরা

সাতের পাতায় দেখুন

হাসপাতাল উন্নয়নের দাবিতে পুরুলিয়ায় গণকনভেনশন

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালটি সাধারণ মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল।

সরকারি নীতির কারণে হাসপাতালটি ধুঁকছে, সাথে যুক্ত হয়েছে দালালচক্র ও কর্তৃপক্ষের অমানবিক ব্যবহার। এলাকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ওই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। ১১ জুলাই চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় নাগরিক কনভেনশন। অন্যতম আলোচক ছিলেন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ অংশুমান মিত্র। কনভেনশন থেকে অনিলদাস মহাপাত্রকে সভাপতি, সুভাষ সিনহাকে সম্পাদক নির্বাচন করে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়।

রায়গঞ্জে শিক্ষা কনভেনশন

এ আই ডি এস ও-র উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাশ কোর্সের সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের জন্য রায়গঞ্জে পৃথক কলেজ স্থাপন ও একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি সহ শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া স্নাতকস্তরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনলাইনে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক চিন্ময় ঘোড়ই, সহ সভাপতি বনমালী পণ্ডা, সুজনকৃষ্ণ পাল, শ্যামল দত্ত সহ অন্যান্যরা। শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক কনভেনশনে যোগ দেন।

মহিষাদলে বিজ্ঞান শিবির

অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিষাদল রাজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজ্ঞান শিবির। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে মহিষাদল সায়েন্স সেন্টারের সহযোগিতায় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুব্রত কুমার মাইতি। শিবিরের মূল আলোচ্য বিষয় 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা' বিষয়ে আলোচনা করেন আই আই টি-র গবেষক ডঃ রাধাকান্ত কোনার এবং ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক নীলেশরঞ্জন মাইতি। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত গৌড়ী বিজ্ঞান গড়ে ওঠার ইতিহাস, যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং আজকের বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কর্তব্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন মহিষাদল রাজ কলেজের অধ্যাপক ডঃ মানস কুমার মাইতি। শেষে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নির্ণয়ে কিছু আকর্ষণীয় পরীক্ষা করে দেখান মহিষাদল সায়েন্স সেন্টারের সদস্যরা। কুসংস্কার বিরোধী নাটক প্রদর্শন করে কাঁথি সায়েন্স সেন্টারের সদস্যরা। শিবিরে তিন শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। শিবির পরিচালনা করেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির যুগ্ম আহ্বায়ক অনুপ মাইতি ও বিশ্বজিৎ রায়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফালাকাটায় ছাত্রদের পথ অবরোধ

ফালাকাটা আশুতোষ পল্লি রেলগেট থেকে উমাচরণপুর ৯ মাইল এলাকা পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি দু'বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রায় গোটা রাস্তাটিই খানাখন্দে ভর্তি। প্রতিদিনই কয়েক হাজার মানুষ বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করে। প্রায়ই দুর্ঘটনা হচ্ছে। রাস্তার পাশেই রয়েছে সুপরিচিত পর্যটন কেন্দ্র। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সারাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন নীরব। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ডি এস ও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। কমিটির উদ্যোগে ২৯ জুন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কুঞ্জনগরে পথ অবরোধ হয়। অবরোধে প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনে সঞ্জয় বর্মন, সাদ্দাম হোসেন, বিশ্বজিৎ বর্মন, পল্লব বর্মন, রমেশ বর্মন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

জংলিরাজ সুন্দরবনে

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার অনুমতিপত্র আছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের। অনুমতি দিয়েছে মৎস্য দপ্তর। কিন্তু বন দপ্তরের কর্তারা এই অনুমতিপত্র মানেন না। ফলে মাছ ধরতে গেলে বন দপ্তর জাল, নৌকা কেড়ে নিচ্ছে, হাজার হাজার টাকা জরিমানা করছে। এই অন্যায় জুলুমবাজি বন্ধের দাবি জানালেও তৃণমূল সরকারের কোনও হেলদোল নেই। ক্ষোভে ফুঁসছে মৎস্যজীবীরা। এদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়ন। ২২ জুন ইউনিয়নের সম্পাদক হাবুলাল কয়াল সহ মোস্লাক মোল্লা, সুকুমার সাউ, হারানন্দ ময়রা, ভাগ্যধর হালদার, তৃশান্ত মণ্ডল, সনাতন দাস প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল কুয়েমুড়ি ফরেস্ট অফিসে ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবি, মৎস্য দপ্তরের লাইসেন্স নিয়েই মাছ ধরতে দিতে হবে, সকল মৎস্যজীবীকে বন দপ্তরের অনুমতিপত্র দিতে হবে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাছ ধরা বন্ধ রাখার সময়কাল ২ মাসের বেশি করা চলবে না। উল্লেখ্য, বন দপ্তর তিন মাস মাছ ধরা বন্ধের ফরমান দিয়েছে।

মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনে মাস্টারদার মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবি

বাঁশদ্রোণী এলাকার অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মাস্টারদা সূর্য সেনের নামাঙ্কিত মেট্রো স্টেশনে তাঁর মূর্তি স্থাপন ও তাঁর জীবন-সংগ্রামের তথ্যসমৃদ্ধ সংগ্রহালয় গড়ে তোলা। এই দাবিতে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলে এ আই ডি ওয়াই ও টালিগঞ্জ-নাকতলা আঞ্চলিক কমিটি। ইতিমধ্যে স্টেশন মাস্টারকে গণস্বাক্ষর সংবলিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড সুকান্ত সিকদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ১ জুলাই মেট্রো ভবনে জেনারেল ম্যানেজারের উদ্দেশে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দাবি সংবলিত ডেপুটেশন দেয়। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে এই উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

পরিচারিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সভাপতিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পথঅবরোধ

বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতা, বাঁকুড়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে কেরানিবাঁধ বাস স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির সদস্যরা। সানবাঁধা অঞ্চলের অন্তর্গত ভাদুল গ্রামের এক পরিচারিকা ওই নেতার বাড়িতে কাজ করতেন। ওই নেতা দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে ধর্ষণ করার পরিণতিতে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। বাঁকুড়া সদর থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় বারবার বলা সত্ত্বেও অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বাধ্য হয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি

গ্রহণের দাবিতে পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে ১২ জুলাই কেরানিবাঁধে ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলে। পুলিশ এসে অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে পরিচারিকাদের দৃঢ়তায় ব্যর্থ হয়। পরে পুলিশ ঘোষণা করে ১৬৪ নং ধারায় জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে ও ৪-৫ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে দাবি পূরণে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে বলে নেত্রীবৃন্দ ঘোষণা করেন।

গোবরডাঙায় বন্ধ হাসপাতাল খোলার দাবিতে গণঅনশন

গ্রামীণ হাসপাতালের বন্ধ ইনডোর বিভাগ খোলার দাবিতে ১৫ জুলাই সকাল ৮টা থেকে ১২ ঘন্টা গণঅনশন চলে উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙা রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ইতিপূর্বে এই হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি পেশ, গণ অবস্থান, বিক্ষোভ, অবরোধ— সবই করেছেন গোবরডাঙা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ। কোনও কিছুতেই সরকারের টনক নড়েনি। উল্টে জেলা পরিষদ বন্ধ করে দিয়েছে ৫৮ বছরের পুরনো ইনডোর বিভাগ। গত বছরের ৪ নভেম্বর থেকে রোগী ভর্তি পুরোপুরি বন্ধ। এলাকার প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রোগীদের যেতে হচ্ছে দূরবর্তী বনগাঁ, বারাসাত অথবা হাবড়া হাসপাতালে।

গোবরডাঙা পৌর উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে এই গণঅনশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা), প্রবীর মজুমদার, পবিত্র মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙা উন্নয়ন পরিষদ), অনিমেষ বসাক (গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন), বাপী ভট্টাচার্য (প্রাক্তন পৌরপ্রধান), বিন্দু দাস (খাঁটুরা প্রয়াস), শান্তনু দে (নিবেদিতা শিশু তীর্থ) ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষ। নেতৃবৃন্দ জানান, যতদিন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল না হচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে।

মদের প্রসারের প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম থানায় ডেপুটেশন

রাজস্ব আদায়ের নাম করে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং অশ্লীলতা রোধ ও নারী নিরাপত্তায় কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ১৬ জুলাই নন্দীগ্রাম থানায় ডেপুটেশন দিল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নন্দীগ্রাম শাখা। ডেপুটেশনের আগে সুসজ্জিত মহিলা মিছিল বাজার পরিক্রমা করে। প্রায় শতাধিক মহিলা এই মিছিলে অংশ নেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন আরতি খাটুয়া, রীতা প্রধান, ইতি মাইতি প্রমুখ।

সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ছাড়া প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়া যায় না

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে তাঁর রচনা থেকে একটি অংশ দেওয়া হল।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ— সমস্ত নেতারই বক্তব্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করতে না পারলে সঠিকভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাই অর্জন করা যায় না। .... দল বিচার ও বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব করবে সে যদি নিম্নতম সংস্কৃতির শিকার হয় তাহলে তার দ্বারা কোনও দিনই বিপ্লব হতে পারে না। মার্কস একটা কথা বলেছেন, To change the world, workers will have to change themselves first — অর্থাৎ শ্রমিকরা একমাত্র তখনই দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারে যখন তারা নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। এই কথার মানে হচ্ছে, শ্রমিকরা চায় বলেই বা কতকগুলো বিপ্লবী বুলি আওড়ানো শিখলেই দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে পারে না ; যে শ্রমিকরা দুনিয়াকে পরিবর্তন করবে, আগে তাদের নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে হবে। কেন মার্কস একথা বলেছিলেন? মার্কসের এভাবে বলার প্রয়োজন কী ছিল? মার্কস তো বলতে পারতেন যে, শ্রমিকরা তাদের বিদ্যাবুদ্ধিগত ক্ষমতার দ্বারা অথবা দৈনন্দিন সংগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মারফত যদি একসময় কতকগুলো বিপ্লবী স্লোগান ও তত্ত্বকথা আওড়াতে পারে, তাহলেই তারা বিপ্লবটাকে কার্যকরীভাবে রূপ দিতে পারবে। না, তা কখনও সম্ভব নয়। কারণ উন্নততর সংস্কৃতিগত মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাকেই সঠিকভাবে অর্জন করা যায় না এবং বিপ্লবী তত্ত্বও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই বিপ্লবী রাজনীতিকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া মানেই হচ্ছে বাস্তবে জীবনটাকেই পরিবর্তিত করা লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই বিপ্লবের মধ্যে জড়িত করে। আর, এটার জন্য দরকার, প্রতিটি বিপ্লবের পূর্বে তার প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অথচ, যাঁরা এই সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবেন, দলের সেই নেতা ও কর্মীরা নিজেরাই যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার

হয়ে থাকেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভ্যাস, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে — তাহলে তাঁরা কোনও দিনই এটা আনতে পারবেন না। এবং এ দিকটায় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলি বাইরের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী দলের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও কর্মীদের, বিশেষ করে নেতাদের জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো ও উন্নততর সাংস্কৃতিক মান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নজর দেননি। এইভাবে তাঁরা শুধু দেশের মানুষকেই ঠকাননি— সৎ ও সরল সাধারণ কর্মীদেরও, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা সব বড় বড় উজির, নাজির, মন্ত্রী হয়ে বসেছেন, তাঁদেরকেও ঠকিয়েছেন। একথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল হল শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক— এক কথায় তার সমস্ত শ্রেণীআকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার। লেনিন বলেছেন, দল হল শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে সচেতন বা বিপ্লবী অংশের সংগঠন, শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী। সেইজন্য শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দলের নেতারা সর্বহারা সংস্কৃতির প্রাণবস্তু (cream)। তাঁরা তো তাঁদের আচার আচরণে, জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে, তা সে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক কিংবা কোনও সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক, সর্বহারা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করবেন। এই সর্বহারা শ্রেণি সংস্কৃতির মূল কথা কী? এর মূল কথা হচ্ছে, এই সংস্কৃতিকে যে আয়ত্ত করেছে, সমস্ত প্রকার সম্পত্তিবোধ থেকে সে মুক্ত। এই সম্পত্তিবোধ বলতে তার সংস্কৃতিগত, রুচিগত ধারণা ও প্রাত্যহিক আচরণগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত। কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বোঝাতে গিয়ে তাই মার্কস যা বলেছেন, তার মর্মার্থ হল, এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত মানবতাবাদ (It is humanism minus private property)। তাই কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হল সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থে বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থে 'দেশের জন্য গাড়ি, বাড়ি, ধনসম্পত্তি, জীবনের সবকিছু পরিত্যাগে'র একটা মূলগত পার্থক্য আছে। কারণ, এই ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তার দ্বারা অহমবোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও হামবড়া ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম যে যথার্থভাবে শুরু করল সে কমিউনিস্ট চেতনার অধিকারী হওয়ার সংগ্রাম শুরু করল মাত্র এবং এ সংগ্রামে সফলতা অর্জন করার পথেই একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড

কর্ণাটকে ছাত্র আন্দোলনের জয়

কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলা প্রশাসন দু'ধরনের স্কুলকে মিলিয়ে একটি স্কুল করে দেওয়ার ফরমান জারি করে। তার ফলে অর্ধেক স্কুল উঠে যাবে। এই ফরমানের বিরোধিতা করে এ আই ডি এস ও-র গুলবর্গা জেলা কমিটি। আন্দোলনে বহু প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেয়। আন্দোলনের চাপে প্রশাসন শেষ পর্যন্ত তাদের ফরমান তুলে নিতে বাধ্য হয়। এই জয় দেখিয়ে দিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুললে তা জয়যুক্ত হতে বাধ্য।

তেলেঙ্গানায় ছাত্র আন্দোলনের জয়

পলিটেকনিক ছাত্রদের সরকার নির্ধারিত ফি ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু একটু নামী কলেজ হলেই ফি নিচ্ছে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র মেধা সত্ত্বেও বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে এ আই ডি এস ও। দু'বছর ধরে ধরনা, মিছিল, সভা প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যায়। আন্দোলনের চাপে সরকার সম্প্রতি বাড়তি নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ছবি ঃ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ধরনায়।

উত্তরপ্রদেশে ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদ

মোরাদাবাদের তীর্থঙ্কর মহাবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি বি এস ছাত্রীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারিতে টালবাহানার প্রতিবাদে যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র যৌথ উদ্যোগে ৬ জুলাই জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ওই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও পুলিশের অশুভ আঁতাত ধ্বংস করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো হয়।

ভর্তির দাবিতে ত্রিপুরায় ছাত্র আন্দোলন

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সুনিশ্চিত করা সহ ৫ দফা দাবিতে ৮ জুলাই অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকারের নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দেয়। কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস সম্পূর্ণ করা, সকল বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা এবং অনার্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়। শিক্ষা অধিকর্তা উপরিউক্ত দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রতিনিধি দলকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

শিক্ষার মানের অবনমন ও বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন গুজরাটের শিক্ষাবিদরা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির গুজরাট শাখার উদ্যোগে ১৩ জুলাই আমেদাবাদের এইচ কে আর্টস কলেজে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সেভ এডুকেশন কমিটির গুজরাট শাখার সভাপতি অধ্যাপক রোহিতভাই শুক্লা। সভার শুরুতে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদিকা রিম্মি বাগেলা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষায় যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার উপর একটি অ্যাপ্রোচ পেপার পাঠ করেন।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক কানুভাই খাডাডিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার ও অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখার্জীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট এই কমিটির অংশ হতে পেরে তিনি গর্ববোধ করেন। পার্টটাইম লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীনেশভাই শাহ তাঁদের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন, বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ হল শিক্ষার মূল সমস্যা।

এইচ কে আর্টস কলেজের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ হেমন্তকুমার শাহ গুজরাটে তথাকথিত 'ভাইব্রান্ট গুজরাট'-এর নামে কী চলছে তা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, সেখানে প্রাথমিকে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৬ লক্ষ ছাত্র ভর্তি হয়, তার মধ্যে কেবল ১০ লক্ষ ছাত্র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে ৬ লক্ষ স্কুল-ছুট হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ও বিশিষ্ট নাগরিক প্রহ্লাদ রায় অবস্থি শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমর্থন করে বলেন, বর্তমান সময় দাবি করছে যে আমরা ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ সবাই মিলে শিক্ষার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। তিনি প্রস্তাব দেন এই আন্দোলনে দাবি তোলা হোক 'নো সার্ভিস নো ট্যাক্স'। বিশিষ্ট সমাজকর্মী দ্বারিকানাথ রথ বলেন, শিক্ষা সমস্যা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে এ বিষয়ে ঐক্যমত্য গড়ে ওঠে।

কমিটির গুজরাট শাখার সম্পাদক ও এম এস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ভরতভাই মেহতা বলেন, সরকারের বেশি আগ্রহ কাজের কাজ কিছু না করে ভালো ভালো বুলি আওড়ানো। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে সরকার যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে এবং শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন তিনি।

এইচ কে আর্টস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও অল ইন্ডিয়া প্রিন্সিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ সুভাষ ব্রহ্মভট্ট উল্লেখ করেন যে, যতটা প্রতিরক্ষা খাতে জোর দেওয়া হয়, ততটাই শিক্ষাখাতে গুরুত্ব কম দেওয়া হয়। আবার বিধানসভা অথবা লোকসভায় সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনায় যত সময় নষ্ট করা হয় তার সিকি ভাগ সময়ও শিক্ষার জন্য দেওয়া হয় না। এমনকী শিক্ষা লোন দেওয়ার ক্ষেত্রেও যেসব ছাত্ররা লক্ষ লক্ষ টাকা লোন নিতে পারে, কেবলমাত্র তাদেরই লোন দেওয়া হয়। তিনি বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেন যে, শিক্ষা রাজ্য তালিকাভুক্ত, রাজ্য সরকারকেই এ বিষয়ে জোর দিতে হবে। বিশিষ্ট নাগরিকদেরই শিক্ষাকে বাঁচানোর জন্যই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

উপস্থিত বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন যে, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র নামে কলেজে যে অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তাতে সুবিধার থেকে অসুবিধাই বেশি হচ্ছে। সেমেস্টার পিছু ২০,০০০ টাকা নেওয়া হলেও কলেজে উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকছে না। পরীক্ষার আগের দিন রাতে এস এম এস বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পরের দিনের পরীক্ষাসূচি জানানো হয়। খেড়া জেলার বড়োদা গ্রাম থেকে আসা মনীষা গ্রামীণ গুজরাটের শিক্ষার চিত্র তুলে ধরে বলেন যে, খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাৎসরিক বন্যার জন্য বর্ষাকালে ৪ মাস স্কুল বন্ধ রাখতে হয়, যার ফলে বেশি সংখ্যায় ছাত্ররা স্কুল ছুট হয়। জাগ্রতি পারমার তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের অ আ ক খ জ্ঞান নেই। শিক্ষকরা ছাত্রদের যে কোনও ভাবে পাশ করানোর জন্য বাধ্য থাকেন, সেজন্য উত্তরপত্রের ভুলগুলি মুছে দিয়ে সঠিক উত্তর লিখে দিতে হয়। তিনি পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের দাবি তোলেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র মিতুল সোলাঙ্কি আক্ষেপ করেন, পাশ করেও তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না।

প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রকাশভাই এন শাহ আই আই এম এবং এফ টি আই আই-এর সাম্প্রতিক ঘটনা তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করতে হবে। শেষে সভাপতির ভাষণে রোহিতভাই শুক্লা পার্শ্ব-শিক্ষকদের দিয়ে বেশি বেশি কাজ করানো, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগগুলির দুরবস্থা, সেমেস্টার ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকার যদি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর থেকে গুরুত্ব কমাতে থাকে তাদের 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' আদৌ কি সম্ভব হবে? পরিশেষে তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আমরা যাব। তাতে যদি কাজ না হয়, তা হলে সেভ এডুকেশন কমিটি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বর্জ্য জল নিকাশির দাবিতে বজবজে রাস্তা অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ-২ নং ব্লকে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিকমুক্ত জলপ্রকল্পের পচা দুর্গন্ধময় বর্জ্য জলে ডোঙারিয়া-রায়পুর অঞ্চলের মানুষ বিপন্ন। প্রতিকারের দাবি জানালেও প্রশাসন উদ্যোগহীন। ফলে 'গ্রাম ও চাষি বাঁচাও কমিটি'র নেতৃত্বে সহস্রাধিক চাষি ও গ্রামবাসী ২ জুলাই ডোঙারিয়া চৌরাস্তা অবরোধ করেন। নোদাখালি থানার আই সি এবং বজবজ ২নং বি ডি ও-র উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা দাবি জানান— দ্রুত বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থায়ী সমস্যা সমাধানে রায়পুর বাজার সংলগ্ন খাল কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অজয় ঘোষ, তাম্রধ্বজ আদক, বাসুদেব কাবড়ি, মোরসেলিম, বিশ্বনাথ মালিক, কালাম প্রমুখ। আন্দোলনের দাবি মেনে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয় ও জমা জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়।

যৌনপল্লিতে রক্ত সংগ্রহ কেন? প্রশ্ন চিকিৎসকদের

"মনোজাইম কিট কেলেঙ্কারিতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু সহ হাজার হাজার মানুষের সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঘটনা থেকে এ রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন যে কোনও শিক্ষাই নেয়নি, সম্প্রতি কলকাতার যৌনপল্লিগুলি থেকে শাসকদলের উদ্যোগে রক্ত সংগ্রহের ঘটনাই তার প্রমাণ। এই সংবাদে রাজ্যের আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। যৌনকর্মীদের মর্যাদাহানি না করেও আমরা ব্লাড ব্যাঙ্কের অধিকর্তা, মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই— রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনগুলি মানা হয়েছে কি? এই হঠকারি সিদ্ধান্তের ফলে যদি একজন ব্যক্তিও এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস বি অথবা সি'র মতো মারণ রোগে আক্রান্ত হন, তার দায় নেবে কে?"

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ার পর এই প্রশ্ন তুললেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র। যৌথ ডেপুটেশনের অপর সংস্থা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত দাবি করেন, "গাইডলাইন দেখাতে না পারা পর্যন্ত সংগৃহীত রক্ত পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সদুত্তর দিতে না পারলে জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অপরাধে উপরোল্লিখিত বিভাগীয় প্রধানদের এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।"

জমি লুঠের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় কনভেনশন

একের পাতার পর

প্রতিবাদে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় 'মিত্তাল প্রতিরোধ মঞ্চ' গড়ে উঠেছে। সেই আন্দোলনও জয়যুক্ত হয়েছে।

কবীর সুমনও কেন্দ্রের জমি নীতির প্রতিবাদ করে বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন আমাদের প্রেরণা। এই আন্দোলনের সাথে সাথে এর পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর তিনি জোর দেন। মোদিজির যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে ২৭ হাজার চাটাই চীন থেকে আনা হয়েছিল। মোদিজির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানের কী হল বলে প্রশ্ন তোলেন গীতেশ শর্মা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, মাত্র ১ টাকায় নেওটিয়াকে হাসপাতালের জন্য জমি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই হাসপাতালে এক দিনের বেডভাড়া নেয় ২৫ হাজার টাকা। এই তো উন্নয়নের চেহারা। নাট্যকার চন্দন সেন কেন্দ্রের জমি বিল সহ নানা অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে নির্বাচনী সমঝোতার পরিবর্তে জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন।

হরিয়ানার সেজ বিরোধী আন্দোলনের নেতা সত্যবান বলেন, সরকারি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ জমি মালিকের পরিবর্তে ৮০ শতাংশ এবং পিপিপি মডেলের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ মালিকের সম্মতির কথা বলা হয়েছে জমি বিলে। জমির মালিক বাদে জমির উপর নির্ভরশীল কৃষক, কৃষিজীবী, ভাগচাষি, খেতমজুর সহ প্রান্তিক জমিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসনের কোনও জায়গা নেই এই বিলে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, যে বাণিজ্য করিডর গড়ে তুলছে সরকার তাতে দেশের ৩২ শতাংশ জমি চলে যাবে। বহুফসলি, সেচ সেবিত জমিও নিয়ে নেবে সরকার। শিল্পের নামে জমি নিয়ে পাঁচ বছর ধরে ফেলে রাখলেও তা ফেরৎ দেওয়া হবে না জমিদাতাদের। জমি দখল করে গুরগাঁওতে যে আবাসন শিল্প হয়েছে সেখানে ফ্ল্যাট খালি পড়ে থাকছে। বিক্রি হচ্ছে না। হরিয়ানায় রিলায়েন্স কোম্পানি সেজ এর-জন্য দশ হাজার একর জমি নিয়েছে। সেই জমি এখন টুকরো টুকরো প্লটে ভাগ করে একর প্রতি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে মুনাফা লুটছে মুকেশ আম্বানি।

বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী যোশি

৫০ শতাংশ জমিই অব্যবহৃত পড়ে আছে, কেউ অ্যাপ্লিকেশন করেনি। তিনি বলেন, সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এক সাক্ষাৎকারে বলে ফেলেছেন, ভারতে ১৯৩০ এর দশকের মতো ভয়ঙ্কর মন্দা আসছে। তিনি আশংকা ব্যক্ত করে বলেন, গ্রামে এখনও যে সামাজিক জীবন আছে তাকে ভেঙে দেবে এই জমি অধিগ্রহণ বিল। জমি চলে যাবে কর্পোরেট হাঙরদের হাতে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতা নন্দ পাত্র এর জন্য মঞ্চের নেতা কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বলা হচ্ছে উন্নয়ন, কিন্তু কোন পথে কার উন্নয়ন— এই প্রশ্ন তোলেন সমর বাগচি।

প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, ইউ পি এ সরকার যে জমি বিল এনেছিল তাও জনস্বার্থে ছিল না। এটাও কর্পোরেটের স্বার্থে তৈরি। পুঁজি এখন অলস হয়ে পড়ে আছে। বাজার নেই। শিল্প হবে কী করে। শিল্পের জন্য জমি চাই এ কথা মিথ্যা। সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া সোসিও-ইকনমিক স্টাডি বলছে দেশের ৭০ ভাগ লোকের আয় শূন্য থেকে ৫০০০ টাকা। ১৪ কোটি কৃষক পরিবার জমিহারা। ৯০ লক্ষ মানুষ জমি ছেড়ে শহরে দিনমজুরি করছে। গত দশকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ খেতমজুরে পরিণত হয়েছে। এদের কেনার ক্ষমতা কতটুকু? কাদের জন্য শিল্প? সরকারি রিপোর্ট বলছে ১২ লক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আর সরকারি নেতারা বিদেশে ছুটছেন পুঁজি আনতে। দেশে কি পুঁজির অভাবে শিল্প হচ্ছে না? তিনি আরও বলেন, দেশের সংবিধানে জমি রাখা কোনও মৌলিক অধিকার নয়, আইনসম্মত অধিকারের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম কোনও বিল পাশ করাতে যৌথ সংসদীয় অধিবেশন ডাকবে মোদি সরকার। তাদের কাছে কর্পোরেটদের স্বার্থ এতটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মীরাতুন নাহার, মেহের আলি ইঞ্জিনিয়ারও বক্তব্য রাখেন।

নাগরিক কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান সাংবাদিক সুমিত চক্রবর্তী, সমাজকর্মী মেধা পাটকার। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী, তপন রায়চৌধুরি, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। কনভেনশনটি সঞ্চালনা করেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। খসড়া প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

ধর্ষক ও ধর্ষিতার বিবাহের নিদান সভ্য সমাজের কলঙ্ক

নিজের দেওয়া রায় ফিরিয়ে নিতে হল মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতিকে। ফলে খারিজ হয়ে গেল ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবকের জামিনের নির্দেশ। তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল ১০ জুলাই। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ — ধর্ষণে অভিযুক্ত যদি কোর্টের বাইরে টাকাপয়সা দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে, এমনকী ধর্ষিতা মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মিটমাট করে নেবার আবেদন জানায়, নিম্ন আদালত যেন সেই আবেদন গ্রাহ্য না করে।

কেন প্রথমে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগে নিম্ন আদালতে সাজা পাওয়া এক যুবককে জামিন দেওয়ার কথা বলেছিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট? জানা গেছে, বিচারপতি এ ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের 'সুখকর সমাপ্তি' চেয়েছিলেন! ধর্ষিতা যেহেতু একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং অবিবাহিত মা হিসাবে অসম্মানের দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন, তাই বিচারপতির মনে হয়েছিল, ধর্ষণকারীর সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়াটাই মেয়েটির পক্ষে 'সম্মানের সঙ্গে বাঁচার' সহজতম রাস্তা। সে কারণেই ২৩ জুন অপরাধীকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোর্টের বাইরেই তারা বোঝাপড়া করে নিতে পারে।

শুধু মাদ্রাজ হাইকোর্টই নয়, নানা নিম্ন আদালত এমনকী রাজ্যে রাজ্যে হাইকোর্টগুলি পর্যন্ত বার বার এই ধরনের নিদান দিয়ে চলেছে। ফলে ধর্ষণ, যা নির্যাতিতার শরীর শুধু নয়, তার মনোজগৎ, মানুষের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, ভবিষ্যতের আশা সমস্ত কিছু বিষাক্ত করে দিয়ে তার সমগ্র চেতনাকেই ছিঁড়ে খুঁড়ে ধ্বংস করে দেয়, তেমন একটি পৈশাচিক অপরাধ করার পরেও ক্ষতিপূরণের নামে কিছু টাকা দিয়ে অপরাধীরা হাত ধুয়ে ফেলছে। আদালত তাদের জামিন দিচ্ছে, সাজা কমিয়ে দিচ্ছে কিংবা ধর্ষিতা মেয়েটির সাথে অপরাধীর বিবাহের নিদান দিয়ে হাসিমুখে মামলা খারিজ করে দিচ্ছে। 'সুখকর সমাপ্তি' ঘটাচ্ছে সমাজশরীরে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়া ধর্ষণ নামক বীভৎস অপরাধের।

এ ভাবে ধর্ষিতা কন্যাটিকে সমাজে পুনর্বাসন দেওয়ার সদিচ্ছায় আরও বড় অন্যায় উপায় খুঁজছে ন্যায়ালয়গুলি। বিবাহের জমকালো সাজসজ্জার তলায় চাপা দেওয়া হচ্ছে অত্যাচারিতা মেয়েটির চোখের জল। অপমান যন্ত্রণায় মেশা তার গুমরানো কান্না হারিয়ে যাচ্ছে ধর্ষণকারী 'স্বামীর' সাজামুক্তির উল্লাসধ্বনির তলায়।

কিংবা হয়তো তা-ও নয়।

পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে সম্মানের ধারণাটি কিছুটা উল্টোরকম । এখানে ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির শিকার হলে সম্মান যায় উৎপীড়িতা মেয়েটির। পরিণতিতে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তো কুমারী মায়ের লজ্জার শেষ থাকে না। সভ্য সমাজ তাকে এক কোণে ঠেলে দিয়ে অপরাধীর তকমা এঁটে দেয় তার শরীরে। আশপাশের মানুষের ফিসফাস আর চোরা চাহনির তীরে সারা জীবন ধরে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় নিরাপরাধ নারীটিকে। কোনও দিন তাকে মাথা তোলবার সুযোগটুকুও দেয় না এই সমাজ। এই পরিস্থিতিতে ওই নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে অত্যাচারী ধর্ষককে আর ঘৃণ্য অপরাধী নয়, এক জন দায়-উদ্ধারকারী বীর বলে মনে করে মেয়েটির পরিজন ও প্রতিবেশীরা। কখনও মোটা অংকের টাকা নির্যাতিতার পরিবারের হাতে গুঁজে দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে ধর্ষণকারী। নির্যাতিতার আত্মীয়স্বজন খড়কুটোর মতো সেই ক্ষতিপূরণটুকু আঁকড়ে ধরতে চায়। অপরাধী সহজেই রেহাই পেয়ে যায় আদালতের বিচার থেকে, আর কোর্টও অত্যাচারিতা সুবিচার পেল ভেবে মহানন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই চরম পুরুষতান্ত্রিক সমাজমননে বেড়ে ওঠা নির্যাতিতা মেয়েটিও হয়তো পরিজনের মতে মত মিলিয়ে অনেক সময় একটু শ্বাস নেবার আশায় ধর্ষণকারী পুরুষটিকেই স্বামী হিসাবে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা চালায়। কিন্তু যে সম্পর্কের মূলে রয়েছে দৈহিক আক্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়ায় চরম ঘৃণা, তা কখনও সুস্থ পারিবারিক জীবনের ভিত গাঁথতে পারে? অবশ্য সে সবের খোঁজই বা রাখে কে!

বস্তুত, নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টগুলির এ হেন কার্যকলাপ শুধু যে মেয়েদের প্রতি চরম অপমানজনক তাই নয়, এ হল গোটা সমাজ পরিবেশকে বিষিয়ে তোলা এক জঘন্য অপরাধকে প্রশ্রয়দান। হয়তো এ কথা উপলব্ধি করেই সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতিদের কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও এই নির্দেশ এই প্রথমবার এল তা নয়। ভারতীয় পেনাল কোডে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আদালতের বাইরে সালিশির যে ধারা ২০০৫ সালে সংযোজিত হয়েছে, সেখানেও এর আওতা থেকে আর্থ-সামাজিক অপরাধ এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টও গত দু'বছরের মধ্যে অন্তত তিন বার কোর্টের বাইরে এভাবে মামলা মিটিয়ে নিতে নিষেধ করেছে। অথচ সে নিষেধ লোয়ার কোর্টগুলি অগ্রাহ্য করেছে বার বার। এবার অন্য একটি মামলা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টে ধর্ষণে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাটিকে 'দর্শনীয় ভুল' বলে চিহ্নিত করায় এ নিয়ে এত হইচই এবং পরিণতিতে রায় ফিরিয়ে নিয়ে জামিন খারিজ করার মতো ঘটনা ঘটল। সামনে চলে এল ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান এবং সে সম্পর্কে আদালতগুলিরও চরম পুরুষতান্ত্রিক, আধিপত্যবাদী, অসংবেদনশীল মনোভাবের বিষয়টি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এই মানসিকতারই বিরুদ্ধে পাল্টা একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। এই রায়কে স্বাগত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশকে হাতিয়ার করে নির্যাতিতা মেয়েরা সমাজে তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে পারবে কি? হয়তো উৎপীড়ক নরপশুটিকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বস্ত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, কিন্তু এই সমাজের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে মর্যাদা নিয়ে নির্ভয়ে তারা বাঁচতে পারবে কি? যেখানে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যেখানে শাসকদলের ছত্রছায়ায়, পুলিশের চোখের সামনে দিনের পর দিন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ধর্ষণকারী নরপিশাচরা, রক্তচক্ষু দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখে নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে, যেখানে আদালতের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতাই নেই অধিকাংশ অত্যাচারিতার, কোনও ক্রমে পৌঁছতে পারলেও নেই প্রতি পদে বিপুল খরচের বোঝা টেনে চলার ক্ষমতা, সেখানে আইন যতই থাক, আদালতের বাইরে সালিশির মাধ্যমে উৎপীড়কের সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়াটাই বাঁচার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াবে না তো? সুপ্রিম কোর্ট কি পারবে এইসব দুর্ভাগা মেয়েদের রক্ষাকবচ দিতে?

উত্তরটা সবারই জানা। তাই ভাবতে হবে অন্য ভাবে। কারণ, ধর্ষকদের জন্ম দিচ্ছে তো এই সমাজ। এ কোন সমাজ, যা নারী দেহকেও মুনাফার হাতিয়ার করতে দেয়, শুধু মুনাফার জন্য মদ-গাঁজা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, ব্যবসার জন্য ভোগবাদকে সর্বদা উসকানি দেয়। এ কোন সমাজ যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে প্রতিদিন পিষে মারছে, লুম্পেন কালচারকেই আধুনিকতার সংজ্ঞা করেছে। এই হল পুঁজিবাদী সমাজ, যা আজ কেবল মানুষকে অনৈতিকভাবে ছিবড়ে করে দিচ্ছে তা নয়, ক্রমাগত মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে উসকানি দিয়ে তাকে পশুর চেয়েও অধম জীবে পরিণত করছে। এই সমাজ ব্যবস্থার দিকে চোখ না দিয়ে, একে ভাঙবার আন্দোলনে যোগ না দিয়ে নারীর সম্মান রক্ষা হবে না।

সরকারি হাসপাতালে দালাল চক্র নির্মূল করার দাবি জানালো এম এস সি

দালাল চক্রের মাধ্যমে ভুয়া ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে এন আর এস মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সুপার কাম ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (এম এস ভি পি)-র কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের (এম এস সি) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেন।

সমস্ত রোগীদের রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালেই করতে হবে, হাসপাতালে দালালচক্র নির্মূল করতে হবে এবং এ ব্যাপারে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে— এই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি জানাতেই এম এস সি-র প্রতিনিধিরা ১৩ জুলাই এম এস ভি পি-র কাছে গিয়েছিলেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অমার্জিত আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ছিটমহল বিনিময় প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, রুটি-রুজি হারানোর ভয় পাচ্ছেন।

অপর পক্ষে, ছিটমহলগুলো প্রশাসনের নজরের বাইরে থাকায় এতদিন ধরে ঐ সব ছিটমহলে জমি মাফিয়ারা, দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়েছে, লুঠপাট-অত্যাচার চালিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে প্রকৃত ছিটমহলবাসীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই একটা অংশ অন্যদের জমি জবরদখল করে বসে আছে, চাষবাস করছে, অবৈধ উপায়ে লিখিত ও অলিখিত ভাবে জমি লেনদেন করছে। এরা প্রকৃত ছিটমহলবাসী নয়। অথচ গণনায় এদের নাম নথিভুক্ত আছে।

খবরে প্রকাশ, এতদসত্ত্বেও ছিটমহলবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তাদের মতামত প্রকাশে নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসনের ব্যাপক দায়িত্ব যাতে না নিতে হয় সেজন্য বলা হচ্ছে, এতদিন ছিটমহলবাসীরা ভারত বা বাংলাদেশ যার সাথে নিকট সম্পর্ক তৈরি করেছিল, বিনিময়ের পরও যেন সেটাই বজায় রাখে। জোর জবরদস্তি এই সম্মতি আদায় করার জন্য তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ছিটমহলবাসীদের জন্য ইতিমধ্যে সরকারি প্রচারপত্র বিলি করে বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই' ১৫-এর মধ্য রাত থেকে ভারতে অবস্থিত সকল বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের ভূখণ্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। সরকারিভাবে মানচিত্রে ছিটমহলের অবলুপ্তি ঘটবে।

৩১ অক্টোবর ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এস ইউ সি আই (সি) এক স্মারকলিপি প্রদান করে। তখনই বলা হয়— তিনবিঘা করিডর নতুন করে কুচলিবাড়ি অঞ্চলকে ছিটমহলে পরিণত করবে। তিনবিঘা করিডর তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জাতিক স্পর্শকাতর এলাকা হয়ে উঠবে, সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করবে। এই কারণে করিডর হস্তান্তরের প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে এই বিষয়ে সর্বদলীয় সভা ও বিশেষ বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হোক এবং চুক্তির ভুল দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বদলীয় প্রতিনিধি পাঠানো হোক। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। ফলে আজ নতুন করে জটিল সমস্যা সৃষ্টি হতে চলেছে।

আজকের এই সমস্যা সমাধানের জন্য — (১) আবেগমুক্ত মন নিয়ে দহগ্রাম, আঙ্গারপোতা ও তিনবিঘা করিডর বিবেচনায় এনে সার্বিক ছিটমহল বিনিময় করতে হবে। এই পথেই সমস্ত রকম সীমান্ত সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নাহলে কুচলিবাড়ি অঞ্চল চারিদিক থেকে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত থাকায় ও করিডর বাংলাদেশকে স্থায়ী লিজ দেওয়ায় কুচলিবাড়ি নতুন করে ছিটমহলে পরিণত হবে। ওই এলাকার জনগণকে চরম দুর্দশার শিকার হতে হবে।

করিডর মারফত দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ভারতের সাথে যুক্ত থাকায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে, করিডর সহ এলাকাটি স্পর্শকাতর হয়ে থাকবে। দুই দেশের শাসকই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাদের ঘৃণ্য স্বার্থে এই এলাকাকে ব্যবহার করে, এতে দুই দেশের জনগণের ঐক্য ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার সম্ভাবনা থাকবে। দুষ্কৃতী, সমাজবিরোধীরাও এর সুযোগ গ্রহণ করবে। তাই বেরুবাড়ির একটা অংশের পরিবর্তে এই দুই ছিটমহলকে করিডর লিজ দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

(২) সমস্ত ছিটমহল উদ্বাস্তুদের (যারা এখনও সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত) ছিটমহলবাসী হিসাবে চিহ্নিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) বর্তমানে ছিটমহলের কৃষক, বর্গাচাষি, খেতমজুর যাঁরা ছিটমহলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন বা আছেন, তাঁদের উপেক্ষা না করে গণনায় নথিভুক্ত করে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) ছিটমহল দখলকারীদের নয়, প্রকৃত অধিবাসীদের নাম নথিভুক্ত করতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। ছিটমহলবাসীদের নাম নথিভুক্তিতে বাধাদানকারী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ দুই দেশকেই গ্রহণ করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

বামপন্থী দলগুলির ডাকে মধ্যপ্রদেশ বনধে ব্যাপক সাড়া

ব্যপম কেলেঙ্কারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ১৬ জুলাই বামপন্থী দলগুলির ডাকা মধ্যপ্রদেশ বনধে ব্যাপক সাড়া। ছবিতে বনধের দিন ভোপালে মিছিল, গুনাতে কলেজ গেটে ছাত্রদের বিক্ষোভ।

সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল'-এর ১৬০তম বার্ষিকী পালন

বিপুল উদ্দীপনার সাথে 'হুল'-এর ১৬০তম বার্ষিকী পালিত হল। ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন, প ব-এর উদ্যোগে এবং গোটা ভারত সিদো-কানহু হুল বাইসি, দুমকা-র সহযোগিতায় এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিদো কানহু'র আহ্বানে দশ হাজারেরও বেশি সাঁওতাল সহ আদিবাসী এবং শোষিত মানুষ যেখানে সমবেত হয়েছিলেন, ঝাড়খণ্ডের সেই ভগ্নাডিহি থেকে ৩০ জুন মোটরসাইকেল র‍্যালির সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন এবং ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের সভাপতি বিশিষ্ট সাঁওতালি সাহিত্যিক সারদা প্রসাদ কিস্কু এবং সভাপতিত্ব করেন গোটা ভারত সিদো-কানহু হুল বাইসি, দুমকা-এর সভাপতি সিদো হেমরম। ফেডারেশনের বিশিষ্ট সদস্য মঙ্গল হেমরম-এর নেতৃত্বে র‍্যালি বর্ধমান পর্যন্ত পৌঁছায়। বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস-এর কার্যকরী সভাপতি বিসম্বর মুড়া। ৭ জুলাই সকালে কলকাতার সিদো-কানহুর স্মৃতিফলকে মাল্যদান করে 'হুল'-এর বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর শিয়ালদার নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটে মোটরসাইকেল আরোহীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সারদা প্রসাদ কিস্কু এবং অতিথি ছিলেন ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ মুর্মু (দিল্লি), ডঃ শীলা এলিজাবেথ বেসরা, ডাঃ আনন্দরঞ্জন বেসরা প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন পরিমল হাঁসদা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শিখা মাণ্ডি ও বিমল মাণ্ডি। এছাড়াও সিউড়ি, বর্ধমান, হুগলির বৈঁচি ও ফতেপুর, নদীয়ার কল্যাণী ও মোহনপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে মোটরসাইকেল আরোহীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে হায়দরাবাদে বিক্ষোভ

হায়দরাবাদে দুই স্কুল ছাত্রীকে হত্যার প্রতিবাদে এবং খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৫ জুলাই ছাত্র-যুব-মহিলাদের পক্ষ থেকে মাসাব ট্যাঙ্ক এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। দাবি ওঠে অশ্লীল ছবির প্রদর্শনী এবং পর্নোগ্রাফি বন্ধ করতে হবে। নেতৃত্ব দেন ডি এস ও-র হায়দরাবাদ জেলা সম্পাদক মাল্লেশ রাজ, এম এস এস জেলা সভানেত্রী হেমলতা, ডি ওয়াই ও জেলা সভাপতি কে ভরত।

কটকে শিক্ষার দাবিতে কনভেনশন

এ আই ডি এস ও-র ওড়িশা রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে ১২ জুলাই কটকের 'র‍্যাভেনশ' কলেজে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবীরা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ, ফি বৃদ্ধি, সেমেস্টার প্রথা, ইতিহাসের বিকৃতি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষাবিরোধী সর্বশিক্ষা অভিযান প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আহূত এই কনভেনশন উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি মনোরঞ্জন মহান্তি। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ বীরেন্দ্র নায়ক, এ আই ডি এস ও-র পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক সৌরভ মুখার্জী এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

ব্যপম কেলেঙ্কারিতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ২০ জুলাই বামপন্থী দলগুলির ডাকে প্রতিবাদ দিবসে হরিয়ানায় যুক্ত মিছিল

এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

জনসভা

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, বিকাল ঃ ৪টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org